জেএসসি ও এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য

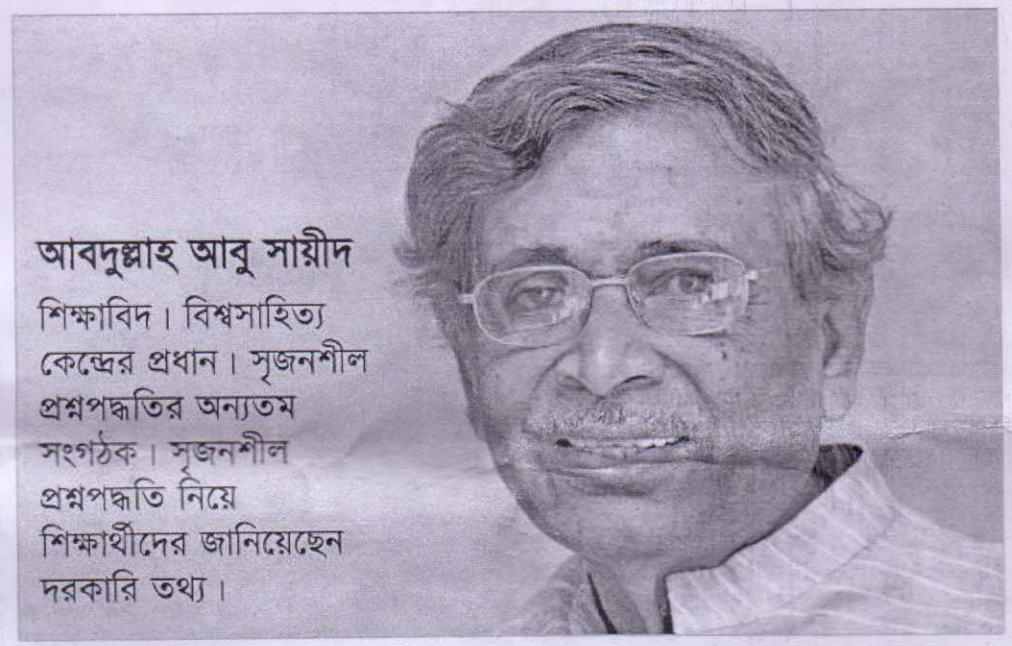

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ
শিক্ষাবিদ। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রধান। সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির অন্যতম সংগঠক। সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি নিয়ে শিক্ষার্থীদের জানিয়েছেন দরকারি তথ্য।

সৃজনশীল প্রশ্ন কী কেন এবং কেমন?

এক

পৌনে ২০০ বছর ধরে আমাদের দেশে যে পরীক্ষা পদ্ধতি চালু আছে, তা কমবেশি মুখস্থনির্ভর। এই পরীক্ষা-পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা গোটা পাঠ্যবই পড়ে না। তারা জানে, প্রশ্ন পুরো বই থেকে হয় না, হয় বিশেষ কিছু চিহ্নিত প্রশ্নের ভেতর থেকে; তাই সেই প্রশ্নগুলো থেকে গোটা কয়েক মুখস্থ করেই তারা পরীক্ষায় ভালো ফল করতে পারে। কষ্টকর শ্রমে প্রশ্নের উত্তরগুলো মুখস্থ করতে হয় বলে কোনো পাঠ্যবইয়েরই ১০০ ভাগের ১০ ভাগের বেশি তাদের পক্ষে পড়া অধিকাংশ সময় সম্ভব হয় না। ফলে, যে ছাত্র ১০০০ নম্বরের পরীক্ষায় পাস করে, সে খুব জোর পাঠ্যবইয়ের শ খানেক নম্বরের উত্তরই শুধু পড়তে পারে, পাঠ্যবইয়ের বাকি ৯০০ নম্বর সম্বন্ধে সে পুরো অন্ধকারে থেকে যায়। এতে তার জ্ঞান হয়ে পড়ে একেবারেই সীমিত, জ্ঞানের যে ব্যাপক আহরণ শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য, তা ব্যাহত হয়।

মুখস্থনির্ভর শিক্ষাপদ্ধতির আরেকটা বিপজ্জনক দিক আছে। এই প্রক্রিয়ায় পরীক্ষার হলে মুখস্থ করা নোট লিখতে পারাই ছাত্রছাত্রীদের প্রধান সাফল্য হিসেবে বিবেচিত হয় বলে প্রতিটি বিষয়ের যে সামান্য কয়েকটি প্রশ্ন পড়ে তারা পাস করে, সেগুলোকে কঠোর শ্রমে বারবার পড়ে পড়ে তারা একসময় মুখস্থ করে ফেলে। ফলে, সেগুলোর বিষয়বস্তু নিয়ে তারা যেমন ভাবে না, তেমনি চারপাশের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে তার প্রয়োজন, অর্থ বা তাৎপর্য বোঝারও চেষ্টা করে না। এতে বিষয়গুলো যেমন তাদের আত্মস্থ হয় না, তেমনি তাদের চিন্তা, বুদ্ধি বা কল্পনাশক্তিরও বিকাশ ঘটে না। এর ফলে পরীক্ষায় ভালো করলেও জীবনের উচ্চতর যোগ্যতার ক্ষেত্রে তারা পিছিয়ে পড়ে। এভাবে দীর্ঘদিন ধরে গৎবাঁধা প্রশ্ন ও মুখস্থের জাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে হয়ে আজ আমাদের জাতির চিন্তার স্ফূর্তি ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা প্রায় শূন্যের কোঠায় এসে ঠেকেছে। আমাদের দেশের অধিকাংশ বয়স্ক মানুষও যে শিশুদের মতো কথা বলে ও ভাবে, তার কারণও এ-ই।

মেধার এই জড়ত্ব থেকে ছাত্রছাত্রীদের মুক্তি দিয়ে তাদের যদি বুদ্ধিমান, উজ্জ্বল ও কল্পনাশক্তিসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হয়, তবে ছাত্রবয়স থেকেই তাদের বুদ্ধি আর চিন্তাশক্তিকে সক্রিয় করে তুলতে হবে। এটা করার একটা বড় উপায়: গোটা ছাত্রজীবন ধরে প্রতিটি পরীক্ষায় তাদের এমন সব প্রশ্ন করে যাওয়া, যার উত্তর মুখস্থ করে তারা দিতে পারবে না, দিতে হবে ভেবে, চিন্তা করে; বুদ্ধি, মেধা আর কল্পনাশক্তিকে পরিপূর্ণ আর জাগ্রতভাবে ব্যবহার করে। এতে তাদের বুদ্ধির চর্চা বাড়বে, মন সক্রিয় হবে, নোট বা পাঠ্যবই মেধাহীনভাবে মুখস্থ না করে নিজেদের বোধ আর চিন্তাশক্তি দিয়ে তারা জীবন ও জ্ঞানের সব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করবে। এককথায়, তাদের মন স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দময় আর সাহসী হয়ে উঠবে। আত্মবিশ্বাস ও চিন্তাশক্তি হয়ে উঠবে পরিণত ও সাবালক।

দুই

যেসব প্রশ্নের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের মেধার জড়ত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে স্বাধীন, স্বতঃস্ফূর্ত ও সৃষ্টিক্ষম করে তোলা যায়, তার নামই সৃজনশীল প্রশ্ন। এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে পাঠ্যবইয়ে লেখা তথ্য ও ভাবনাগুলো শুধু চিন্তাহীনভাবে মুখস্থ করলে চলবে না, সেগুলো ভালোভাবে বুঝতে হবে এবং চারপাশের জীবন ও বাস্তবতার সঙ্গে মিলিয়ে দৈনন্দিন জীবনে তার প্রয়োগ করতেও শিখতে হবে। এ জন্য প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নকে ভাগ করা হয় চারটি অংশে। এই চারটি অংশের উত্তর থেকে ছাত্রছাত্রীদের স্মৃতিশক্তি ও চিন্তাক্ষমতার বিভিন্ন স্তর যাচাই করা সম্ভব হয়। প্রশ্নপত্রে প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ১০ নম্বর বরাদ্দ থাকে। এবার দেখার চেষ্টা করি, প্রশ্নের ওই চার অংশের কোনটির দ্বারা ছাত্রছাত্রীর স্মৃতিশক্তি, বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তাক্ষমতার কোনটিকে কীভাবে যাচাই করা সম্ভব। প্রশ্নের প্রথম অংশটি খুবই ছোট। এ অংশের জন্য বরাদ্দ থাকে মাত্র ১ নম্বর। এই অংশের উত্তর দেখে যাচাই করা যায় ছাত্র বা ছাত্রীটির স্মৃতিশক্তি কতটা প্রখর। অর্থাৎ, পাঠ্যবইয়ে ওই অংশের সঙ্গে সম্পৃক্ত পর্বটুকু সে পড়েছে কি না, আর পড়ে থাকলে তা তার ঠিকমতো মনে আছে কি না। এই অংশটুকু হলো প্রশ্নের 'জ্ঞানমূলক' অংশ।

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

জেএসসি ও এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য

সৃজনশীল প্রশ্ন কী কেন এবং কেমন?

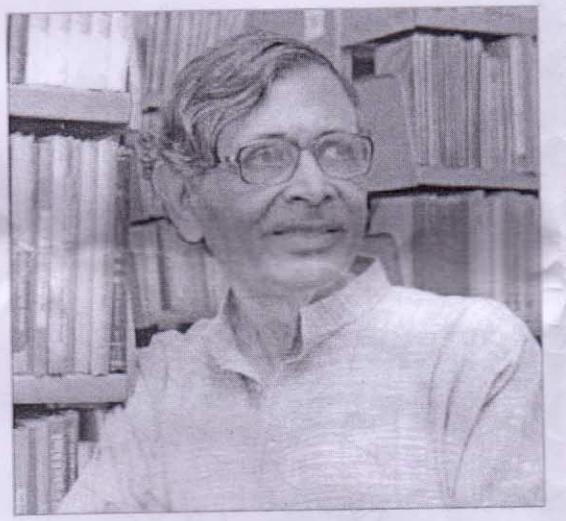

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

শিক্ষাবিদ। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রধান। সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির অন্যতম সংগঠক। সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি নিয়ে লিখেছেন জরুরি লেখা।

গতকালের পর

প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশে যাচাই করে দেখা হয় পাঠ্যবইয়ের সংশ্লিষ্ট বিষয়কে সে ভালোভাবে বুঝেছি কি না। অর্থাৎ, তার বোঝার বা অনুধাবন করার ক্ষমতা কতটুকু। প্রশ্নের এই অংশটুকুকে বলা হয় 'অনুধাবনমূলক' অংশ। প্রশ্নের এই অংশের জন্য ২ নম্বর বরাদ্দ থাকে।

প্রশ্নের তৃতীয় অংশে এমন একটি জিনিস এসে যোগ হয়, যা খুবই নতুন। আমাদের অতীতের গতানুগতিক ধারার প্রশ্নে এই জিনিস কোনো দিন ছিল না। এর নাম 'উদ্দীপক'। এর উদ্দেশ্য ছাত্রছাত্রীর মনকে পাঠ্যবইয়ের সীমিত গণ্ডি থেকে বাইরের জগতের সংস্পর্শে নিয়ে আসা, যাতে পাঠ্যবইয়ে পড়া বিষয়কে বাস্তব পৃথিবীর সঙ্গে মিলিয়ে বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাপারটিকে সে অনুধাবন করতে পারে।
এখন প্রশ্ন, এই উদ্দীপক জিনিসটি কী? উদ্দীপক হলো এমন ছোট্ট গদ্যাংশ বা পদ্যাংশ অথবা গ্রাফ, চার্ট, ছবি ইত্যাদি, যার বক্তব্যের সঙ্গে ওই প্রশ্নের কোথাও না কোথাও এক বা একাধিক অনুভূতি বা চিন্তার নিবিড় মিল আছে।
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রশ্নের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের উত্তর শুধু পাঠ্যবই থেকেই দেওয়া যায়। কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ অংশের উত্তর দিতে হয় উদ্দীপকের সহায়তা নিয়ে।

প্রশ্নের তৃতীয় অংশে যাচাই করে দেখা হয়, পাঠ্যবইয়ে যেসব চিন্তা, ধারণা বা অনুভূতি রয়েছে, তার মধ্যকার যেগুলো ওই উদ্দীপকের ভেতর আছে, সেগুলোকে সে খুঁজে বের করতে পারছে কি না। অর্থাৎ, পঠিত বিষয়ের ভেতর থেকে সে যেসব চিন্তাভাবনা আহরণ করেছে, বাইরের ভিন্ন পরিবেশ ও ভিন্ন বিষয়ের ভেতর সেগুলোকে সে প্রয়োগ করতে পারছে কি না। প্রশ্নের এই অংশকে বলা হয় 'প্রয়োগমূলক' অংশ। প্রশ্নের এই অংশের জন্য ৩ নম্বর বরাদ্দ থাকে।
প্রশ্নের চতুর্থ অংশে যাচাই করে দেখা হয় ওই অংশের সঙ্গে সম্পর্কিত পাঠ্যবইয়ের জায়গাটুকু ও উদ্দীপকের ভেতরকার ভাবনাচিন্তা, অনুভূতি-কল্পনাশক্তি, গভীরতা-ব্যাপকতা ইত্যাদিকে ছাত্রছাত্রীরা তুলনা করে বুঝতে পারছে কি না, এদের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য, উচিত-অনুচিত, ভালো-মন্দ ইত্যাদি বিচার-বিবেচনা করে তার নিজস্ব মতামত গড়ে তুলতে পারছে কি না। অর্থাৎ, তুলনামূলক বিচার-বিবেচনার ভেতর দিয়ে তার নিজস্ব ও আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি সে তুলে ধরতে পারছে কি না। প্রশ্নের চতুর্থ অংশের জন্য ৪ নম্বর বরাদ্দ থাকবে। প্রশ্নের এই অংশকে বলা হয় 'উচ্চতর দক্ষতা'র অংশ। আর একটা কথা মনে রাখতে হবে, সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের বহুনির্বাচনিক প্রশ্নগুলোও কিন্তু 'সৃজনশীল' ধরনের। কেবল তথ্য জানলেই এগুলোর সঠিক উত্তর দেওয়া যায় না; এগুলোর উত্তর দিতেও সৃজনশীল প্রশ্নের মতো একই রকম বুদ্ধি, চিন্তা ও কল্পনাশক্তির দরকার পড়ে।

তিন

একজন ছাত্র বা ছাত্রীর পক্ষে প্রশ্নোত্তর মুখস্থ করার মতো কষ্টসাধ্য ও নিরর্থক ব্যাপার আর কিছুই হতে পারে না। এই নির্মম শ্রম শিক্ষাজীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে তো বটেই, সেই সঙ্গে তার চিন্তা, বুদ্ধি ও কল্পনাপ্রতিভার স্ফূর্তিকেও বন্ধ্যা করে ফেলে। তাই ওই প্রশ্নপদ্ধতি বদলে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিতে মুখস্থের জায়গা নেই। ছাত্রছাত্রীকে কেবল তার পাঠ্যবইটি মন দিয়ে ভালো করে বুঝে বুঝে পড়তে হবে, মনের আনন্দে মজা করে বারবার শুধু পড়ে যেতে হবে। এটুকু করলেই যেকোনো ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় যথেষ্ট ভালো ফল করতে পারবে।
আগেই বলেছি, আমাদের গতানুগতিক পরীক্ষাপদ্ধতিতে প্রশ্ন করা হতো সীমিত কিছু প্রশ্নের ভেতর থেকে। তাই শিক্ষার্থীরা মুখস্থ করত হাতে গোনা কিছু প্রশ্ন। ফলে, পাঠ্যবইয়ের একটা বিরাট অংশ তাদের জ্ঞানের বাইরে থেকে যেত। অন্যদিকে, সৃজনশীল পদ্ধতিতে ছাত্রছাত্রীদের কোনো কিছুই মুখস্থ করতে হয় না, কিন্তু পড়তে হয় পুরো পাঠ্যবইটি। কেননা, এই পদ্ধতিতে প্রশ্ন করা হয় গোটা পাঠ্যবইয়ের সবখান থেকে। তা ছাড়া এই পদ্ধতিতে সব সময় পরীক্ষায় আসে নতুন প্রশ্ন। ফলে, প্রশ্ন কমন পড়ার কোনো আশা এখানে নেই। তাই ছাত্রছাত্রীদের আগের মতো অল্প কিছু প্রশ্ন পড়লে আর চলে না, গোটা বইয়ের প্রতিটি চ্যাপ্টার বুঝে বুঝে বারবার পড়তে হয়। এতে তাদের জ্ঞানের পরিধি আগের ছাত্রদের তুলনায় অনেক বেড়ে যায়। বিশ্বের যেকোনো দেশের ছাত্রছাত্রীদের সমপরিমাণ জ্ঞান লাভ করে তারা। তাই বিশ্ব-প্রতিযোগিতায় কোনোখানে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের পেছনে পড়ে থাকার কারণ থাকে না।

চার

মুখস্থ করা নির্মম পরিশ্রমের ব্যাপার। ছাত্রছাত্রীদের এটা খুবই কষ্ট দেয়। তাই এই মুখস্থনির্ভর পদ্ধতির পরীক্ষাকে তারা ভয় করে। তার বদলে মনের খুশিতে পাঠ্যবই পড়ে পরীক্ষা দিতে তারা অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। তা ছাড়া সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় বুদ্ধি খাটিয়ে, নিজের মেধা ও চিন্তাশক্তিকে উদ্দীপ্তভাবে ব্যবহার করে। এতেও তারা আনন্দ পায়। তাই ইতিমধ্যে স্কুল পর্যায়ে সৃজনশীল প্রশ্ন ছাত্রছাত্রীদের কাছে খুবই প্রিয় হয়ে উঠছে। কলেজ পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের কাছেও যে এ জনপ্রিয় ও আনন্দময় হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।
আজ জাতিকে সৃজনশীল করে তোলার একটা বড় উপায় এই সৃজনশীল প্রশ্ন। এই প্রশ্নপদ্ধতি চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে মুখস্থ-যুগের অবসান হবে এবং বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে। এত দিন সেই ছাত্র বা ছাত্রীই ছিল ভালো ছাত্র বা ছাত্রী, যার স্মৃতিশক্তি ছিল ভালো। সৃজনশীল প্রশ্ন সেই ধারা পাল্টে দেবে। আজ সেই হবে ভালো শিক্ষার্থী যার বুদ্ধি, চিন্তা ও কল্পনাশক্তি জাগ্রত আর সক্রিয়, পৃথিবীকে যে নিজের বিদ্যাবুদ্ধির আলোকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ। ফলে, পুরোনো পৃথিবীকে পাল্টে নতুন পৃথিবীর জন্ম দেওয়া সম্ভব হবে। (শেষ)